e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ১১ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | মার্চ ২০১৬

জানা অজানা

শব্দের ভাষা, ভাষার শব্দ

মানুষ মস্তিষ্ক ‘হা-হা’, ‘হি-হি’, ‘আহ’, ‘উহ’ ইত্যাদির মানে খুব চট করে বুঝে নেয়। অর্থাৎ, আনন্দ, কষ্ট, ব্যথা, কান্নার ধ্বনি শুনলেই আমাদের কাছে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে যায় যে তা কোন অনুভুতি ইঙ্গিত করেছে। বোঝা যায় যে কেউ আনন্দ বোধ করছে, কষ্ট পাচ্ছে, বা দুঃখে আছে। সে তুলনায়, বাক্যে গঠিত শব্দের মানে বুঝতে আধ সেকেন্ড হলেও বেশি সময় লাগে আমাদের মস্তিষ্কের। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এমনটাই দেখা গেছে।

কেন এমন হয়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকগিল ইউনিভারসিটির গবেষকরা বলছেন যে, মানুষের ব্রেন বা মস্তিষ্ক প্রথমে ধ্বনি সঙ্কেতের দ্বারাই ভাব বিনিময় করায় অভ্যস্ত ছিল। তার মানে, মানুষ এক সময় আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই মুখে নানা ধরনের আওয়াজ আর অঙ্গভঙ্গি করেই ভাব প্রকাশ করত আর অন্যেরা তার মানে বুঝে নিত। যেমন, শিম্পাঞ্জি, গোরিলা, হাতি, হনুমান, কুকুর, বেড়াল, সহ প্রায় সব প্রাণীই করে থাকে। মানুষ কথা বলতে শিখেছে অনেক পরে। কবে শিখল, আর কী করেই বা ভাষার উৎপত্তি হল তা অবশ্য এখনও কেউ জানে না। তবে ধরে নেওয়া হয় ভাষা এসেছে পরে। যে ২,০০,০০০ বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে আছে তার অনেকটাই কেটেছে ‘হুঁ’ ‘হাঁ’ ‘হুস’ ‘হাস’ ‘হা রে রে রে’ করে। তাতেই অভ্যস্ত ছিল আমাদের মগজ। তাই ভাষার শব্দের চেয়ে ধ্বনির মানে সে চট করে বোঝে।

সূত্রঃ এনভায়রনমেন্টাল নিউজ

অকল্পনীয় শক্তিধর এক প্রাণী

ফুটন্ত জল, জোরাল অ্যাসিড, হিমাঙ্কের বহু নীচের ঠান্ডা, বিকিরণ কিছুই তোয়াক্কা করে না

দশ হাজার বছর আগের পুরনো ডিম, তবুও তা ফুটে পট পট করে খুদে খুদে ছানা বেরিয়ে পড়ল! এ কোনও রূপকথার শিশুভোলানো গল্প নয়। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেন এক দল খনন কর্মী।

নব্বুইয়ের দশকে, আমেরিকার গ্রেট সল্ট লেক-এ তেলের সন্ধানে মাটিতে খনন কাজ চলছিল। যন্ত্রপাতি দিয়ে মাটি কাটতে কাটতে এক সময় শক্ত নোনা মাটির মধ্যে থেকে উঠে আসে ছোট ছোট ডিমের মতো দেখতে এক তাল জমাট বস্তু। কী করবেন স্থির করতে না পেরে কৌতুহলী কর্মীরা সেটিকে জলে ডুবিয়ে রেখে দেন। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যায় কিছু ছোট ছোট ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে ততোধিক ছোট ছোট ছানা, যারা দেখতে অনেকটা চিংড়ির মতো। স্বাভাবিক কারণেই ঘটনাটা আলোড়ন ফেলে। একটা শুকন খটখটে, প্রায় পাথর মনে হয় এমন এক বস্তু থেকে কিনা বেরিয়ে এল কয়েকটি জলজ্যান্ত প্রাণী! ছুটে এলেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেল প্রাণীটির নাম ‘ব্রাইন শ্রিম্প’ বা যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে ‘নোনা চিংড়ি’। কিন্তু আরও এক অত্যাশ্চর্য তথ্য অপেক্ষা করছিল সকলের জন্য। গবেষণাগারে ডিমের খোলাগুলির কারবন ডেটিং (বয়স মাপার পদ্ধতি) করে জানা গেল সেগুলি ১০,০০০ বছর পুরনো। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে, ওই ডিমের তাল বাচ্চা ফোটার আগেই জল থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মাটির মধ্যে আটকে যায়। অথবা হয়তো প্রাকৃতির কোনও বিশেষ খেয়ালে জলের স্তর নেমে যায় হঠাৎই। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে তার ওপর জমতে থাকে মাটির পলি। কিন্তু দশ হাজার বছর পর আবার জলে চুবিয়ে দিতেই কিছু কিছু ডিমের মধ্যে শুরু হয় প্রাণের স্পন্দন। আলোয় ফুটে বেরোয় কচি কচি বাচ্চা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ব্রাইন শ্রিম্প হল পৃথিবীর সবচেয়ে সহ্যশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকায় এদের জুড়ি নেই। ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে শুকিয়ে নিন, প্রচন্ড ঠান্ডায় – যে তাপমাত্রায় সদাচঞ্চল এটমও অবশ হয়ে পড়ে – রেখে দিন তাদের, ১০৫ সেলসিয়াস তাপে সেদ্ধ করুন, মানুষের শরীর গলিয়ে দেয় তেমন কড়া অ্যাসিডে চুবিয়ে দিন, বন্ধ করে দিন সম্পূর্ণ বাতাসহিন ‘ভ্যাকুয়াম’ বাক্সে, বা নামিয়ে দিন সমুদ্রের গভীরে, ২০,০০০ ফিট নীচের অসহনীয় জলের চাপে – ব্রাইন শ্রিম্প কিন্তু, কোনওক্রমে হলেও, বেঁচে থাকবে।

এরা বড় সমুদ্রের বাসিন্দা নয়। এরা থাকে নোনা জলের হ্রদে, যেমন আমেরিকার গ্রেট সল্ট লেক বা ক্যাসপিয়ান সাগরে। মাত্র ১৫ মিমি লম্বা এই প্রাণীগুলি চিৎ সাঁতার দিয়ে চলে। আর নিঃশ্বাস নেয় পা দিয়ে। এরা খুব ছোট ছোট জলজউদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে। আর এরা নুন খুব ভালবাসে।

এবার ২ পাতায়

কুকুরের মা

দক্ষিণ কোরিয়ায় লোকে কুকুর পুষতে ভালবাসে না, কুকুর খেতে ভালবাসে। সেখানকার সাবেকি রন্ধনপ্রণালীতে কুকুরের মাংস বেশ সুখাদ্য বলে মনে করা হয়। সে হেন দেশে, জুঙ্গ মিয়ঙ্গ-সু এক ব্যতিক্রমী মানুষ। কচি কচি কুকুর ছানাদের

আগলে রাখাই তাঁর লক্ষ্য। মহিলার বয়স ৬১। বেশ গরিব। থাকেন সে দেশের আসান শহরে। একটি দোকানে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন। আর ফেলে দেওয়া পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন বাক্স কুড়িয়ে তা বিক্রি করে উপার্জন করেন আরও কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পাহাড়-ঘেঁষা আস্তানার আশ্রয়ে আছে ২০০ কুকুর। জুঙ্গ বলেন: “আমি ওদের মা।”

আর সে কারণেই লোকে তাঁকে বাঁকা চোখে দেখে। সাত সাত বার পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হয়েছে অন্যত্র। তাঁর কুকুর নিয়ে থাকাটা পছন্দ করে নি প্রতিবেশিরা। কিন্তু হাল ছাড়েন নি জুঙ্গ। সঙ্কটাপন্ন কুকুর দেখলেই তাকে নিয়ে আসেন তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে।

সূত্রঃ দ্য গার্ডিয়ান

গঙ্গায় প্লাস্টিক

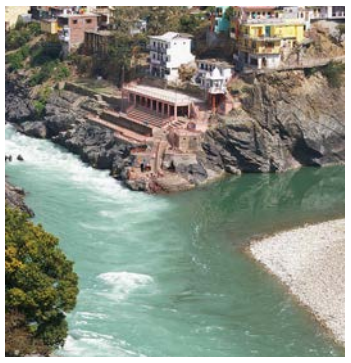

হরিদ্বার থেকে গৌমুখ পর্যন্ত গঙ্গার দু ধারে প্লাস্টিক আর পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করল ভারতের জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল। হোটেল আর ধর্মশালাগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ নিয়ম না মানলে তাদের মোটা টাকা জরিমানা দিতে হবে। গঙ্গায় দূষণ কমানোই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। হরিদ্বার, হৃষিকেশ হয়ে গঙ্গার পাশে পাশে যে রাস্তা দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে গঙ্গার উৎসস্থল গোমুখের দিকে চলে গেছে সেখান দিয়ে কয়েক হাজার পর্যটক আর পুণ্যার্থী চলাচল করেন প্রতিদিন। পথে হোটেলে ধর্মশালায় দিন কাটান। আর বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের আবর্জনা সৃষ্টি করেন সেখানে। অনেক দিন ধরেই তা গঙ্গার জলে মিশে দূষিত করছিল নদীকে। এখন তা কিছুটা হলেও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রঃ পায়োনিয়ার

সঠিক, বেঠিক প্রকৃতিই ভাল বোঝে

প্রকৃতি নিজেই যখন তার ব্যবস্থাপনা বা দেখভাল করত তখন সে অনেক সক্রিয় ছিল, অনেক বেশি কার্বন সে শুষে নিতে পারত। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতির কাছ থেকে সেই ক্ষমতা কেড়ে নিল, গাছ কেটে নিজের পছন্দমত গাছ লাগিয়ে অরণ্যের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল, সেদিন থেকেই গাছেদের কর্মক্ষমতা কমতে লাগল। বিবিসি'র পরিবেশ সংবাদদাতা ম্যাট ম্যাকগ্রাথ'র সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন বলছে, গত ২৫০ বছর ধরে অরণ্য সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি হাতে নেওয়াতেই মানুষ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় সেই বিপদ সংকেত ধরা পড়ছে।

আসলে সুদূর অতীতে প্রকৃতির সংসারে অরণ্য তার আপন খেয়ালে চলত। গাছ-পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-সাপ-ব্যাঙ নিয়ে সে ছিল বন্য আদিম অরণ্য। কিন্তু আধুনিক জগতে ইউরোপের ৮৫% গাছপালাই হয়ে গেল মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং দেখা গেল গত ১৫০ বছরে বনবিভাগ কেবল দ্রুত বাড়ে এবং বানিজ্যিক মূল্য বেশি, যেমন স্কটস পাইন, নরওয়ে স্প্রুস ইত্যাদি গাছই লাগিয়ে গেল।

অনেকেই ভাবলেন, যেহেতু গাছেদের কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতা আছে তাই ইউরোপের অরণ্যে এই দ্রুত বেড়ে ওঠা গাছেরাও সেখানকার বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড তাড়াতাড়ি শুষে নেবে। যা বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে খুবই যুগোপযোগী।

কিন্তু সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে যতটা ফিরে যেত, চওড়া পাতার গাছের বদলে কনিফার বা পাইন জাতীয় সরু পাতার গাছ বেছে নেওয়ায় ততটা ঘটল না। পরিবেশে তার প্রভাব পড়তে লাগল। এবং 'খুব ভাল ব্যবস্থাপনায় থাকা অরণ্যেও আজকাল দেখা যাচ্ছে কার্বন শোষণ কম হচ্ছে, ১৭৫০ সালের প্রাকৃতিক অরণ্য যতটা করতে পারত তার তুলনায়'। জানিয়েছেন ফ্রান্সে জলবায়ু-বিজ্ঞান ও পরিবেশ নিয়ে চলা এক গবেষণার পরিচালক ড: কিম নডটস। তাঁর মতে কনিফার জাতীয় গাছ লাগানোর ফলে ইউরোপে তাপমাত্রা বাড়ছিল ০.১২ ডিগ্রি। কারণ কনিফার জাতীয় গাছের অরণ্য বেশি সৌর-রশ্মি শোষণ করে।

মুসকিল হল বহু দেশের সরকারই এখন জলবায়ু মোকাবিলায় গাছ লাগানোকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। চিন তো গাছের 'বিশাল সবুজ প্রাচীর'ই গড়ে তুলছে। সেই কাজ যখন সম্পন্ন হবে তখন ৪০ কোটি হেক্টর জুড়ে সেই গাছের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু কী ধরনের গাছ আমরা লাগাচ্ছি এবং কীভাবে তার ব্যবস্থাপনা করছি সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। অন্তত গবেষকরা তেমনই পরামর্শ দিচ্ছেন। কিম'র মতে বনের ওপর এতটা আশা রাখাও ঠিক নয় যে বাতাসে নির্গত দূষণ সমস্যার সব উপসম সে ঘটাবে। কারণ এটা দেখাই গেল যে ইউরোপের বড় অংশে বিশেষ করে কনিফার জাতীয় গাছ লাগিয়ে দূষণ হয়তো কিছু কমলো কিন্তু উষ্ণতা কমানো গেল না। তাই কনিফারের বদলে চওড়া পাতার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করেন গবেষকরা।

বিচিত্র প্রাণী, অসীম ক্ষমতা

১ পাতা থেকে

সমুদ্রের জলে নুনের পরিমাণ মাত্র ৩.৫ শতাংশ, কিন্তু জলে নুনের পরিমাণ ৫০ শতাংশ হলেও নোনা চিংড়ি তাতে দিব্বি থাকে। এমনকী নুনের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হলেও তারা তাদের প্রাণটুকু ধরে রাখতে পারে।

তাহলে তারা কি সব প্রতিকুল পরিস্থিতি সামলে নিতে পারে? তারা যে সব হ্রদ বা নোনা জলের জলাশয়ে থাকে সেগুলি মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায় – কখনও কিছুদিনের জন্য, কখনও বা কয়েক বছর ধরে সেগুলি থাকে সম্পূর্ণ শুকন। তখন তারা কি করে?

বেঁচে থাকার জন্য তারাও নিজেদের শুকিয়ে ফেলে । শরীরের সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। জলবিহীন খটখটে মাটিতে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক কেবল প্রাণটি আঁকড়ে এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তারা। যে দিন আবার জলের ছিটে লাগে তাদের শরীরে, সেদিন আবার ঘুম ভাঙ্গে তাদের – পা নেড়ে, আড়মোড়া ভেঙ্গে, চোখ মেলে তাকায়।

তাদের বেঁচে থাকার এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতার জন্য মহাকাশেও গিয়েছিল তারা – মহাকাশ যানে চেপে, নভচরদের সঙ্গে। মহাকাশে

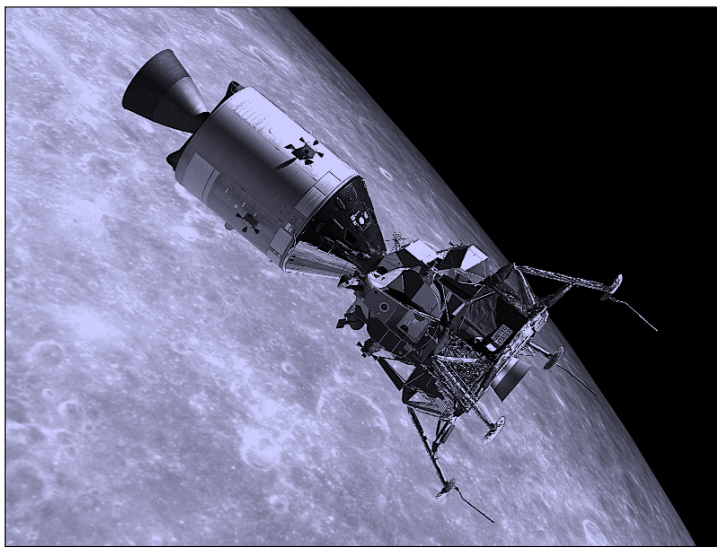

কোনও পর্দা নেই। পৃথিবীর চারপাশে আছে বায়ুমন্ডল, যা মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের কাছে পৌঁছতে দেয় না। বায়ুমন্ডল যদি না থাকত, তাহলে সেই সব রশ্মির বিকিরণ আমাদের শরীরের বাইরে-ভেতরে নানা মারণ রোগ সৃষ্টি করত। কিন্তু মহাকাশে বায়ুমন্ডলের আস্তরণ নেই। সেখানে শুধুই শূন্যতা। তাই পৃথিবীর কোনও প্রাণী যদি 'স্পেস স্যুট' বা মহাকাশে চলার বিশেষ পোষাক ছাড়াই মহাশূন্যের আলোয় গা ভাসিয়ে দেয়, তাহলে কি হবে তার? প্রশ্নটা জেগে ছিল বিজ্ঞানীদের মনে।

তাই খোঁজ পড়েছিল ব্রাইন শ্রিম্পদের। তারা কী মহাকাশে আলোর বিকিরণ সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারবে? সে ক্ষমতাও কি আছে তাদের? মহাশূন্যের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ওই খুদে প্রাণীরা দেখিয়ে দিয়ে ছিল, তারা তাও পারে। বিকিরণের জ্বালাযন্ত্রনা সহ্যকরে বেঁচেছিল অনেকেই। ফিরে ছিল পৃথিবীতে, যেখানে তারা বাস করেছে আজ ১০ কোটি বছর ধরে। প্রকৃতি কেন ওই খুদে প্রাণীদের এমন অসীম সহ্যশক্তি দিল তা কি জানা যাবে কোনও দিনও? **সূত্রঃ বিবিসি**

সমুদ্র শশা

শশার মতো দেখতেও নয় খেতেও নয়। তবু সি-স্লাজকে কেন যে সমুদ্র শশা বলা হয় কে জানে। দেখলে অনেকটা কোনও সবজি মনে হলেও আদতে সে একটি জলজ প্রাণী। সাগরে জলের নীচে প্রবাল প্রাচীর বা পাথরের খাঁজ-খোঁজে দেখা যায়। মূলত জলজ উদ্ভিদ খেয়েই বাঁচে। খুব একটা নড়াচড়া করে না বলে কাঁকড়া, লবস্টার, মাছ ও নানা সামুদিক প্রাণীর সে খাদ্য হয়ে ওঠে এমনকী মানুষেরও। ঠিক খাদ্য হিসেবে না হলেও সনাতনি ওষুধ হিসেবে, বিশেষ করে প্রাচ্যে এই সমুদ্র-শশার ব্যবহার বহু প্রাচীন। সাগরের পরিবেশ ঠিক রাখায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাদা-কালো-হলুদ-কমলা-বেগুনি ইত্যাদি রঙের অন্তত কয়েক হাজার প্রজাতি আছে।

বনের পাখি বন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে

বনের বাসিন্দা গ্রে প্যারটরা রীতিমতো কথা বলে। তবে বনের পাখি বন থেকেই উধাও হয়ে যা"ছ। কথাবলা এই গ্রে প্যারট ১৯৮০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশ আমদানি করেছে ৮ লক্ষ। এবং নথিভূক্ত এই সংখ্যার বাইরে অরণ্যের আরও কত পাখি পাচার হয়ে গেছে তার কোনও হিসেব নেই। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'র একটি সংবাদ থেকে আরও জানা যা"ছ যে, সাধারণত বন্য এই কথাবলা গ্রে প্যারটরা বন্দি অবস্"ায় তেমন বাঁচে না। তাই মনে করা হ"ছ গন্তব্য রপ্তানি বাজারে পৌঁছনোর আগেই এই বুনো গ্রে প্যারটদের ৪৫-৬৫ শতাংশ মারা পড়ে। এবং বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল'র মতে গত ২০ বছরে দেশের মধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানির জন্য ১০ লক্ষেরও বেশি গ্রে প্যারট ধরা হয়েছে মধ্য ও পশ্চিম অফিকা থেকে।

এই কথক গ্রে প্যারটদের পোষার চাহিদা অত্যন্ত বেশি। ১৯৯০ এর দশকেও ঘানার গভীর অরণ্যে ধূসর রঙের ওপর লাল নীল পোঁচের হাজার হাজার এই প্যারটকে এক সঙ্গে একেবারে দেখা যেত। কিন্তু এই বছর প্রকাশিত একটি সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে ঘানা থেকে এই প্যারটরা প্রায় উধাও হয়ে গেছে। মূলত বেড়ে চলা

পাখির ব্যবসা এবং অরণ্যের ধ্বংস হতে থাকা, বিশেষ করে প্যারটদের বসবাসের বড় বড় গাছ কেটে ফেলা প্রকৃতি থেকে তাদের নির্বাসিত করছে। উগান্ডা, রোয়ান্ডা, তানজানিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই এই পাখিদের আর দেখা যায় না।

আসলে মানুষের কথাকে অদ্ভুৎ ভাবে নকল করার অসাধারণ ক্ষমতাই আফ্রিকার এই প্যারটদের সারা বিশ্বেই পোষ্য হিসেবে জনপ্রিয় করেছে। আর তার এই অসাধারণ ক্ষমতাই তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমেরিকা অবশ্য ১৯৯২ সালেই আফ্রিকান এই গ্রে প্যারট আমদানি করা নিষিদ্ধ করেছে। ইউরোপের দেশগুলিও নিষিদ্ধ করেছে ২০০৭ সাল থেকে। কিন্তু এই বুনো পাখির ব্যবসা চলছেই, আর বন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তারা।

এশিয়াতেই আছে সব থেকে বেশি দূষিত নদী

জেনে রাখা ভাল

দূষিত জল তো শুধু মানুষ নয়, জীব-জন্তু, গাছপালা এক কথায় সমস্ত প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষেই ক্ষতিকর। এবং বিশ্ব জুড়ে ব্যবহার যোগ্য জলের জোগান কমতে থাকার অন্যতম কারণই হল ক্রমবর্ধমান জলের দূষণ। যেমন -

● ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ওয়াচ'র সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর সাড়ে ৩০০ কোটি মানুষ জল সঙ্কটের মুখোমুখি হবে মূলত জলদূষণের জন্য।

● এশিয়াতেই সব থেকে বেশি দূষিত নদী আছে যা আর পৃথিবীর কোথাও নেই। এবং সেই বেশির ভাগ নদীর জলে যে ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় তা মানুষের বর্জ্য থেকেই আসে। পৃথিবীর প্রায় ৭০ কোটি মানুষ

দূষিত জলই পান করে।

● আমেরিকার ৪০% নদী ও ৪৬% সরোবরের জল দূষিত। এবং সেই জল সাঁতার কাটা, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়।

● শিল্প-বর্জ্য'র ৭০%ই কোনও না কোনও জলাশয়ে ফেলা হয় যার থেকে জল-দূষণ ঘটে। প্রতি দিন ২০ লক্ষ টন মানুষের বর্জ্য নদী বা অন্য জলাশয়ে ফেলা হয়।

● ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ফান্ড বা ইউনিসেফ'র হিসেব অনুযায়ী প্রতিদিন পৃথিবীতে ৩০০০ এর বেশি শিশুর মৃত্যু হয় দূষিত জলপানের জন্য।

● জলজপ্রাণির নিশ্চিহ্ন হওয়ার মাত্রা স্থলচর প্রাণীর থেকে ৫ গুণ বেশি।

● এবং ভারতে প্রতি দিন ১০০০ শিশুর মৃত্যু হয় দূষিত জলপানের জন্য।

সূত্রঃ কনজার্ভ-এনার্জি-ফিউচার.কম

মুম্বাইয়ে চিতাবাঘ সাফারি

মানুষকে আক্রমণ করে জেলে যাচ্ছে লেপার্ড বা চিতাবাঘ। মুম্বাই-এর কাছে সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায়ই চিতাবাঘ বেরিয়ে আসে লোকালয়ে। সেখানে কখনও কখনও আক্রমণ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এমনই ৫ চিতাবাঘ এখন খাঁচায় বন্দি। বনদপ্তর তাদের পুনরায় জঙ্গলে ছাড়তে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু অনন্তকাল তাদের বন্দি করে রাখাও যায় না। সব সাজারই তো মেয়াদ আছে! তাই এখন ঠিক হয়েছে তাদের নিয়ে তৈরি হবে সাফারি পার্ক। যেখানে এক বড় ঘেরা এলাকার মধ্যে তারা থাকবে। সেখানে গাছপালা দিয়ে তৈরি করা হবে বনের আবহ । আর বিশেষ গাড়িতে চড়ে বন্যপ্রাণ প্রেমীরা কাছ থেকে চিতাবাঘদের দেখার সুযোগ পাবেন।

সূত্রঃ প্রোটেকটেড এরিয়া

ঘড়িয়ালের দিন কি ঘনিয়ে আসছে

চরম বিপন্নতার মধ্যে রয়েছে সে। ভারতের প্রকৃতিতে প্রায় ১২০০ আর নেপালে রয়েছে শ'খানেক। কুমির নয় কিন্তু প্রায় কুমিরের মতোই বিশাল এই জলজ প্রাণী ঘড়িয়ালকে যদিও একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে তথা উত্তরের নদীগুলিতে প্রচুর দেখা যেত। সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা এবং মহানদী-ব্রাহ্মণী-বৈতরণী এমনকী মায়ানমারের ইরাবতী নদীতেও তার চলাচল ছিল। কিন্তু গত ৭০ বছরে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন তারা একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। একদা মোট সংখ্যার মাত্র ২ শতাংশে নেমে এসেছে।

এমনিতে ১৯-২০ ফুট লম্বা বিশাল আকৃতির এই জলচর প্রাণীটির জলজ জীবনে তেমন কোনও শত্রু নেই। তবে গভীর, স্বচ্ছ ও খরস্রোতা নদীর বাসিন্দা ঘড়িয়ালদের গায়ের চামড়াই তার বিপদ ডেকে আনে। কারণ মূল্যবান ওই চামড়ার জন্য মানুষই তার একমাত্র শিকারি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্রমবর্ধমান নদীর দূষণও। যা তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটকে আরও ত্বরান্বিত করছে। কালচে ধূসর রঙের ঘড়িয়ালের দীর্ঘ সরু চোওয়াল, ছুঁচলো নাকবিশিষ্ট এই ঘড়িয়ালরা কুমির জগতে সব থেকে দ্রুতগামী।

সরু চোওয়াল বলেই কুমিরের মতো তারা বড় কোনও প্রাণী শিকার করতে পারে না। বিশাল লম্বা ঘড়িয়াল'র ওজোন ৪৫০ কেজি পর্যন্ত হয়। মাছই তাদের প্রধান খাদ্য। ব্যাঙ, অন্যান্য পোকামাকড়ও তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে। তবে তারা কখনও মানুষ মেরেছে এমনটা শোনা যায় নি। জলচর হলেও নদী থেকে দূরে বালির মধ্যে গভীর গর্ত খুঁড়ে ২০-৯০ ডিম পাড়ে। এবং ৭০-৯০ দিনে ডিম ফুটে ঘড়িয়াল ছানারা বেরিয়ে আসে।

বিপন্ন যারা

সাধারণত মৎস্যজীবীদের হাতেই ঘড়িয়াল নিধন হয়। মূলত তাদের চামড়ার জন্য। সনাতনি ওষুধ তৈরিতেও কাজে লাগে তারা। আর তাদের ডিম চুরি হয় খাওয়ার জন্য। ঘড়িয়ালরা বাঁচে সাধারণত ২০-৩০ বছর। সত্তরের দশকেই ঘড়িয়াল বিলুপ্তির শেষ সীমায় চলে গিয়েছিল। আবার সত্তরের দশকেই তার সংরক্ষণে সীলমোহর পড়ে এই আশায় যে চোরা শিকার তাতে বন্ধ হবে। তাদের সুরক্ষায় দেশে ৯ সুরক্ষিত কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সূত্রঃঅ্যানিমেল কর্নার, উইকিপিডিয়া

হাত বাড়ালেই ডিম, তাই শেষ হয়ে গেল পাখি

ডিম মানুষের বড় প্রিয় খাদ্য। এখন জানা যাচ্ছে যে ৫০ হাজার বছর ধরে মানুষ ডিম খাচ্ছে। আর শুধু তাই নয়, ডিমের প্রতি তার প্রবল আসক্তির ফলে পৃথিবী থেকে এক প্রজাতির পাখি বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার উটপাখি আমাদের পরিচিত। কিন্তু তাদের চেয়েও এক বড় পাখি ছিল সেখানে। লম্বায় তারা ছিল সাত ফিট। ওজনে ৫০০ পাউন্ড বা ২২৬ কেজি। উটপাখির মতোই ওড়ার ক্ষমতা ছিল না তাদের। আকারে বিরাট হওয়ার ফলে, তাদের ডিমও ছিল ততোধিক বড়। অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সর্বত্রই ছিল তারা। বিজ্ঞানীরা তাদের নাম দিয়েছেন 'জেনিয়োরনিস'।

জেনিয়োরনিস যেমন বিরাট পাখি ছিল, তেমনই সে সময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিল ৪৫০ কেজি ওজনের ক্যাঙ্গারু। ২৫ ফিট লম্বা গিরগিটি, দৈত্যকায় এমনই এক খরগোস জাতীয় প্রাণী, যার ওজন ছিল দু টন। আর আমাদের মারুতি গাড়ির মত বড় কচ্ছপ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, ওই সব অতিকায় প্রাণী নাকি অস্ট্রেলিয়ায় ৫০,০০০ বছর আগে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে কী করে তা ঘটে ছিল জানা না গেলেও, জেনিয়োরনিস পাখির বিলুপ্তি রহস্য বিজ্ঞানীরা সমাধান করতে পেরেছেন বলে দাবি করছেন। তাঁরা বলছেন যে, ওই পাখির ডিম, যার সুবাদে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল, সেই ডিমই তাদের

অবলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ দু-পায়ে চলা মানুষ নামক যে প্রাণীটি আগন্তুক হয়ে উপস্থিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়, তাদের জিভে সুস্বাদু লেগেছিল ওই পাখির ডিম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভারসিটি অফ কলোরাডো অ্যাট বোল্ডার-এর বিজ্ঞানীরা অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২০০ জায়গায় ওই পাখির ডিমের খোলার অবশেষ পেয়েছেন। খোলাগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডিমগুলি আগুনে পোড়ান হয়েছিল যুগ যুগ আগে। সব দিক বিচার করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন যে কোনও দাবানল বা প্রাকৃতিক অগ্নিকান্ডে পোড়ে নি সেগুলি, বরং পোড়ান হয়েছিল। আর তা করার ক্ষমতা তো ছিল এক মাত্র মানুষেরই।

বড় বড় ডিম তারা কি আগুনে ঝলসে 'অমলেট' করে খেত? হয়তো তাইই। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যেমন অমলেট বানান সম্ভব ছিল তেমনটাই করত সে কালের মানুষ। আর জেনিয়োরনিস পাখির ডিম ছিল অতি সহজলভ্য। ও পাখি গাছে বাসা বানাত না। ডিম পাড়ত মাটিতে। ফলে সর্বভূক মানুষের দল জেনিয়োরনিস-এর ডিম টপাটপ তুলত আর খেত। আর ঠিক এই কারণেই ওই পখির সংখ্যা দিন দিন কমতে কমতে এক দিন পাখিটাই বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবী থেকে।

সূত্রঃ নিউজওয়াইজ

চাকরিহীন হাতিদের খিটখিটে মেজাজ

মনের কথা

ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমারে হাতিদের মেজাজ আজকাল ভাল যাচ্ছে না, কারণ তাদের কাজ নেই। এক সময় তারা জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছের গুঁড়ি শুঁড়ে করে নিয়ে যেত খাড়াই পাহাড়ের পথ দিয়ে। সে ছিল খুবই কষ্টের জীবন। কিন্তু কর্মহীনতার চেয়ে তা যেন ছিল ঢের ভাল। সেখানকার হাতিদের তাই মত।

মায়ানমারের এক কালের বিখ্যাত ঘন জঙ্গল এখন অনেকটাই ফাঁকা। তাছাড়া তিন বছর আগে নতুন আইন হয়েছে। সেখানকার প্রসিদ্ধ কাঠ এখন আর বিদেশে রপ্তানি হয় না। তাই কাঠের ব্যবসায়ে চলেছে ঘোর মন্দা। কাঠ কাটা কমে গেছে। গুঁড়ি টানার প্রয়োজন নেই। তাই চুপচাপ বসে প্রায় ২,৫০০ কর্মহীন হাতি। মায়ানমারে আনুমানিক ৫,৫০০ পোশা হাতি আছে।

তাদের মালিকরা বলছেন বসে বসে হাতিরা ক্রমশ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। একটুতেই রেগে যাচ্ছে তারা। আর বদ মেজাজি হাতি যে মোটেই কোনও সহজ পাত্র নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না! থাইল্যান্ডের এক হাতি বিশেষজ্ঞ, জন এডওয়ার্ড রবার্টস, বলছেন হাতিরা কাজে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তাদের মন-মেজাজ বিগড়ে যায়।

তাছাড়া হাতিদের খাওয়ান আর তাদের দেখা শোনা করা বেশ খরচ সাপেক্ষ। একটি ৪,৫০০ কেজি ওজনের হাতি প্রায় ২০০ কেজি খাবার খায় প্রতিদিন।

কাঠ বওয়ার কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য ঠিকই, কিন্তু সে দেশের হাতি বিশারদরা বলছেন ওই পরিশ্রম হতিদের শরীর ভাল রাখে। এখন বসে বসে তারা নাকি মোটা হয়ে যাচ্ছে!

দেখা গেছে চিড়িয়াখানায় যে সব হাতি থকে তাদের চেয়ে বেশ কয়েক বছর বেশি বাঁচে মায়ানমারের ওই খেটে-খাওয়া হাতিরা। অবার এও দেখা গেছে শ্রমজীবী হাতির বাচ্চার তুলনায় চিড়িয়াখানার হস্তি শাবকরা ওজনে ভারি হয়। শরীরে মেদ জমার কারণেই চিড়িয়াখানার হাতিদের আয়ু কম হয়, বলেছেন গবেষক জরজিয়া মেসন।

মায়ানমারে কর্মী হাতিরা যাতে ভাল থাকে সে জন্য বেশ কড়া শ্রমআইন আছে। দিনে আট ঘন্টার বেশি কাজ নয়। সপ্তাহে দু দিন ছুটি। বয়স ৫৫ হলেই অবসর। মায়েদের বাচ্চা লালন করার জন্য ছুটির ব্যবস্থা। তাছাড়া আছে গ্রীষ্মের ছুটি আর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত। এ সব আইন হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। তা এখনও বলবত আছে।

কিন্তু কাঠের ব্যবসা ক্রমশ কমে আসায়, হাতিদের কী গতি হবে তা নিয়ে চিন্তায় সরকার। ভাবা হচ্ছে কিছু কিছু করে তাদের আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে তারা কয়েক পুরুষ পরে আবার ফিরে পাবে স্বাধীন জীবন। কিন্তু পোষা হাতিরা জঙ্গলের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে প্রাণী বিষেশজ্ঞদের। তাছাড়া মানুষের সঙ্গে অনেক কাল বাস করার ফলে তাদের শরীরে এখন নানা ধরনের জীবানু বাসা বেঁধেছে। তারা জঙ্গলে ফিরে গেলে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে নানা রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে, এমন আশঙ্কাও করছেন প্রাণীবিষেশজ্ঞরা।

ফলে কর্মহীন হাতিদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তাদের মালিকরা। কেউ কেউ তাদের ভার বহন করতে না পেরে পোষ্যদের বেচে দিচ্ছেন থাইল্যান্ডে। সেখানে তারা পর্যটকদের পিঠে বসিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কাজ পাচ্ছে, অথবা খেলা দেখিয়ে দিন কাটছে তাদের। তবে বেশিরভাগ হস্তি মালিকই বলছেন তাঁরা তাঁদের হাতিদের কোনও মতেই বিক্রি করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন হাতিরা তঁদের প্রিয়জন, পরমাত্মীয়।

সূত্রঃ নিউ ইয়র্ক টাইমস

দেওয়াল লিখন

পৃথিবীর ৫০ শতাংশ মানুষ দূষিত বাতাস নিয়েই বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে আজ। অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ কোটি মানুষ বায়ু দূষণের শিকার হচ্ছে।

এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকসন ইন্ডেক্স

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: March 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● রাইনোসেরাস বিটল বা গুবরে পোকাকেই পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিমান প্রাণী মনে করা হয়, যেহেতু সে নিজের ওজনের প্রায় ৮৫০ গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে। অর্থাৎ একজন মানুষের পিঠে ৭৬ মোটর গাড়ি বহন করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন, ওই গুবরেরা ঠিক ততটাই শক্তিধর।

● মানুষ যে পাখিকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল সে হল হাঁস।

● ইঁদুররা সব ধরনের খাবার খায়, এমনকী তাদের মৃত স্বজাতিকেও খেয়ে ফেলে।

● কিউই পাখিরা অন্ধ হয়। তারা শিকার করে গন্ধ শুঁকেই।

● ঈগল পাখিরা খুব বড় বড় বাসা বানায়। তাদের বাসার ওজন এমনকী ২ টন পর্যন্ত হতে পারে।

● সাপেরা সব সময়ই চোখ খোলা রাখে, এমনকী যখন তারা ঘুমোয় তখনও।

মাছ চুরি চলছে

পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে খুব বেশি মাছ ধরা হচ্ছে আর সেই সঙ্গে খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে মাছের ভান্ডার। কানাডার ব্রিটিশ কোলাম্বিয়া ইউনিভারসেটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে অনেক দেশ তথ্য গোপন করে এসেছে। তারা যে পরিমাণ মাছ ধরে প্রতি বছর তার পুরো হিসেবটা তারা দেয় না। মৎস বিজ্ঞানী ও গবেষক ড্যানিয়েল পলি এমনটাই বলেছেন। দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় জাহাজে যে মাছ ধরা হয় কেবল তারই হিসেব দেওয়া হয় আর ট্রলার যে মাছ ধরে বা স্রেফ বিনোদনের জন্য যে মাছ শিকার করা হয় তার কোনও হিসেব দেয় না কোনও দেশ। ফলে সমুদ্রে যে হারে মাছ কমে যাচ্ছে তা এত দিন ধারণার বাইরে ছিল। এর পরিণামটা ভাল হবে না, বলেছেন পলি। পৃথিবীর ছোট ছোট মৎসজীবীদের জালে ক্রমেই মাছ পড়বে কম। ফলে তাঁদের স্বল্প উপার্জন আরও কমে যাবে। তাছাড়া যে সব মানুষ এক টুকর মাছ থেকেই তাঁদের প্রোটিনের চাহিদা মেটান, তাঁদের আহারে মাছের পরিমাণ আরও কমার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

সমুদ্রের নীচে শব্দদূষণও মাছ কমে যাওয়ার একটা কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইংল্যান্ডের এক্সেটার ইউনিভারসিটির প্রাণীবিজ্ঞানী স্টিফেন সিমসন গবেষণা করে দেখেছেন সমুদ্রে জাহাজ বা অন্য ধরনের মোটর-চালিত নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ কিছু কিছু মাছকে হতভম্ব করে দেয়। ওই আওয়াজে তারা এতটাই বিচলিত হয়ে পড়ে যে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। আর তাদের ওই দিশেহারা অবস্থার সুযোগ নিয়ে শিকারি মাছেরা সহজেই তাদের ধরে খেয়ে নেয়। ফলে কিছু মাছ কমে যাচ্ছে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত হারে।

সূত্রঃ ইন্টার প্রেস সার্ভিস, নিউজওয়াইজ

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। মশার মাধ্যমে সংক্রমিত জিকা ভাইরাস থেকে যে অসুখ হচ্ছে তা নিয়ে সারা বিশ্বে বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে বিশাল উদ্বেগ। জিকা নামের যে জঙ্গলে এই ভাইরাস প্রথম আবিষ্কার হয় সেটি কোন দেশে?
(ক) ব্রাজিল (খ) এল সালভাদোর (গ) সোমালিয়া (ঘ) উগান্ডা

২। ৬০০ বছর অজানা থাকার পর ১৮১৮ সালে জেনারেল টেলর কি আবিষ্কার করেছিলেন?
(ক) লুম্বিনিতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান (খ) মিশরের পিরামিড (গ) সাঁচিস্তূপ (ঘ) আন্দামানের জারোয়া উপজাতি

৩। পৃথিবীর মোট জলের কতটা মানুষের ব্যবহারযোগ্য?
(ক) ৯৭% (খ) ৩% (গ) ১% (ঘ) ৩৩%

৪। রাজা অমরাশক্তির তিন ছেলেকে সুশিক্ষা দেবার জন্য বিষ্ণুশর্মা যে সব কাহিনি বলেছিলেন তাদের সঙ্কলিত নাম কি?
(ক) পঞ্চতন্ত্র (খ) কথাসরিৎসাগর (গ) হিতোপদেশ (ঘ) কুমারসম্ভব

৫। মীর ইউসুফ আলি খান'র ব্যক্তিগত সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে কোন সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে?
(ক) হাজারদুয়ারি (খ) সালারজঙ (গ) কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (ঘ) জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা

৬। পৃথিবীর ক্যাডমিয়ামের প্রায় ৭৫% কিসে ব্যবহার হয়?
(ক) ব্যাটারি (খ) জেট প্লেনের ইঞ্জিন (গ) প্যারাশুটের কাপড় (ঘ) স্টেথোস্কপ

৭। ভারতের বন বিভাগ বুনো হাতি ধরার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তার নাম কি?
(ক) ঘোটালা (খ) কুমকি (গ) খেদা (ঘ) সারোয়াজুলুম

৮। এই উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে কোনটিতে সৌরশক্তির ব্যবহার সব থেকে বেশি?
(ক) দক্ষিণ আফ্রিকা (খ) ভারত (গ) চিন (ঘ) পাকিস্তান

৯। শৈশবে মগজের পুষ্টি কম হবার একটি প্রধান কারণ হল খাদ্যে আয়োডিনের অভাব। কিসের মাধ্যমে আয়োডিনের এই ঘাটতি মেটানো সব থেকে কার্যকর?
(ক) লবন (খ) দুধ (গ) ভাত (ঘ) জল

১০। আন্তর্জাতিক সীমান্তের একদিকে ভারতের রক্সৌল, অপর দিকে নেপালের কোন শহর?
(ক) নেপালগঞ্জ (খ) বিরাটনগর (গ) লুম্বিনি (ঘ) বীরগঞ্জ

উত্তর: ১/ঘ; জিকা জঙ্গলে মেকাক বানরের রক্তে এই ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে ১৯৪৭ এ; আর প্রথম রোগগ্রস্ত মানুষ ডাক্তাদের নজরে আসে ১৯৫৪ তে; ২/গ; ৩/গ; ৪/ক; ৫/খ; ৬/ক; ৭/গ; ৮/খ; ৯/ক; ১০/ঘ ।

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com